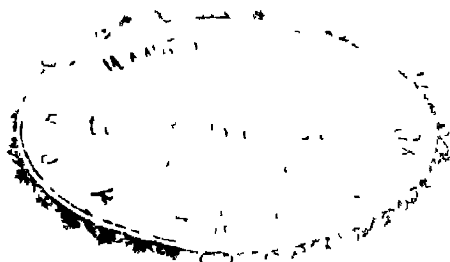
তিন আনা সংস্করণ জীবন চরিতাবলী

দ্বিজেন্দ্রলাল



শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী

পুনর্মুদ্রণ

জন্মাষ্টমী, ১৩৫০

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা



মূল্য তিন আনা

প্রিণ্টার ঃ—এস সি মজুমদার

দেব প্রেস

২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দ্বিজেন্দ্রলাল

এক

এই সেই দ্বিজেন্দ্রলাল, যিনি ডি, এল, রায় নামে বাংলার আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট পরিচিত,—এই সেই দ্বিজেন্দ্রলাল যাঁর "বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" "জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান" "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো" প্রভৃতি গান আজ বাংলার নিভৃত পল্লী থেকে নগরের বালক বৃদ্ধ তরুণ তরুণীর কণ্ঠে সুধা ছড়িয়ে দিচ্ছে,—যা চিরনূতন, চিরমধুর, যার স্বদেশ-প্রেমের অমৃত ধারা বাঙ্গালীর প্রাণকে মাতিয়ে তোলে। এই সেই দ্বিজেন্দ্রলাল, যাঁর হাসির গান বাঙ্গালীর শুষ্ক নীরস হৃদয়ে রসের ধারা ছুটিয়ে দিচ্ছে। এই সেই স্বদেশপ্রাণ কৌতুকপ্রিয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, যাঁর "চন্দ্রগুপ্ত" "সাজাহান" সিংহল বিজয়" "মেবার পতন" "রাণা প্রতাপ" "পরপারে" "বঙ্গনারী" ইত্যাদি নাটক বাংলার নাট্য-সাহিত্যে একটা নূতন যুগ এনে দিয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয় ১২৭০ সালের ৪ঠা শ্রাবণ কৃষ্ণনগর সহরে। তাঁর পিতার নাম কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, মায়ের নাম

প্রসন্নময়ী। এঁরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। দ্বিজেন্দ্রলালেরা সাত ভাই, ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ।

পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্র রায়ের দেওয়ান ছিলেন। তিনি তাঁর পবিত্র চরিত্র, অমায়িকতা ও সরলতা, দয়া ও পরোপকারের জন্য সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। বাংলা সাহিত্যের দিকে তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। ইংরেজী, আরবী ও পার্শী ভাষায়ও তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল। এই সব গুণের জন্য সেকালের যাঁরা সব স্বনামধন্য মহাপুরুষ, তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর বন্ধুদেব মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি মহাপুরুষদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জননী প্রসন্নময়ীও সমস্ত গুণের আধার ছিলেন। তিনি ছিলেন নবদ্বীপের অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশের কন্যা। কাজেই তাঁর মধ্যে সেই পবিত্র বংশের বহু সদ্‌গুণ স্থান লাভ ক'রেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল মাতাপিতার বহু গুণের অধিকারী হয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মাতাপিতার কনিষ্ঠ পুত্র, তাই জনক জননী এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের স্নেহ ভালবাসার অন্ত ছিল না। সেই অপরিসীম আদর স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশবকাল কৃষ্ণনগরেই অতিবাহিত হ'য়েছিল।

ধনীর পুত্র এবং এত আদর ভালবাসার মধ্যে প্রতিপালিত

হযেও দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন পরম বিনয়ী ও স্থির ধীর , চাঞ্চল্য, চপলতা বা দুরন্তপনা তাঁর মধ্যে মোটেই ছিল না। শৈশবেই সাধারণ বালকদের চেয়ে তিনি ছিলেন একটু অসাধারণ। খেলা-ধূলা দৌড়ঝাপ তিনি বড় ভাল বাসতেন না। নির্জ্জনে একাকী এক জাযগায় বসে চিন্তা করতেই তাঁকে বেশী সময় দেখা যেতো। বেশ ভূষার দিকে তাঁর আড়ম্বর ছিল না, সমস্ত বিষয়েই বাল্যকাল থেকে যেন তাঁকে একটু উদাস-উদাস মনে হতো। পল্লীর রমণীয় প্রাকৃতিক শোভা বালক নিবিষ্টচিত্তে ব'সে দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

ছয বৎসর যখন দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স তখন তিনি কৃষ্ণনগরের এক পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। তাঁর আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি দেখে গুরুমহাশয মুগ্ধ হয়ে সকলের কাছে তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করতেন। তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির একটু পরিচয় আমরা এখানে দিচ্ছি—

একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল সকালে পড়াশুনার সময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর সেজো দাদা জ্ঞানেন্দ্রলাল তা দেখে তাঁকে ডাকিযে ইতিহাসের কতকটা পড়া তখনি বসে মুখস্থ করে দিতে বলে আবার তিনি অন্য কাজে চলে গেলেন। যে পড়াটা তিনি দিয়ে গেলেন তা মুখস্থ করতে প্রায় দু'ঘন্টা সময়ের দরকার। জ্ঞানেন্দ্রলাল কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখেন দ্বিজেন্দ্রলাল আবার খেলা করছেন। পড়া তৈরি না ক'রে খেলার জন্য তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে পড়া নিয়ে আসতে বল্লেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিমুখে ইতিহাসখানা এনে দাদার হাতে তুলে দিয়ে জলের মত পড়া মুখস্থ ব'লে গেলেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল বালকের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখে আশ্চর্য্য হলেন।

ছোটবেলা থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যবাদী ছিলেন। পাঠশালায় তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সত্যবাদী বালক ব'লে গুরু-মহাশয়েরা জানতেন এবং যখনি ছাত্রদের কোনো বিবাদ বা গোলমালের বিচার করা আবশ্যক হতো, তখনি তাঁরা দ্বিজেন্দ্র-লালকে জিজ্ঞেস করতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যা' সত্য তাই বলতেন। তাঁর এই সত্যবাদিতার জন্য সমপাঠীরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতো।

ছোটবেলায় দ্বিজেন্দ্রলাল বড রোগা ছিলেন। অনেক কঠিন কঠিন রোগের হাত থেকে তিনি শৈশবে রক্ষা পেয়েছেন।

পল্লীর সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে দেখে শৈশব থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে ধীরে ধীরে কবিত্বের সঞ্চার হ'তে থাকে। বাল্যকালেই তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। পুত্রের কবিতা দেখে পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র একদিন বন্ধুদের সুমুখে বলেছিলেন—"তোমরা দেখো, দ্বিজু আমার কালে একজন বড কবি হবে।" পিতার সেই আশীর্ব্বাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

পিতার ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলালও চমৎকার সঙ্গীত-শক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল বড় মধুর। দীনবন্ধু মিত্র,

বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পিতৃবন্ধুগণ বালক দ্বিজুর কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনে শতমুখে তাঁর প্রশংসা করতেন।

পরিণত বয়সে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত সুধায় সমস্ত বাঙ্গালী জাতি মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

দুই

পাঠশালার পড়া শেষ হলে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগর সরকারী উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখানে তিনি প্রায়ই ক্লাশে প্রথম থাকতেন। শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁর স্মরণশক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রশংসার সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তারপর হুগলী কলেজে তার পড়া আরম্ভ হয। পূর্ব্ব থেকেই তাঁকে ম্যালেরিয়া ধ'রেছিল। কলেজে পড়বার সময় ম্যালেরিযা রাক্ষসী তাঁকে ভাল রকমেই আক্রমণ করে। অত্যন্ত স্মৃতিশক্তি থাকা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল বারবার ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এফ্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় ফল ভাল করতে পারলেন না, সাধারণ ভাবে পাশ করলেন মাত্র।

রোগশয্যায় পড়ে পড়ে বই পড়া ছিল তাঁর আর একটা রোগ। ভাল ভাল ইংরেজী ও সংস্কৃত বই তখন তিনি পড়তেন। ইংরেজীতে তাঁর অধিকার জন্মেছিল চমৎকার। অধ্যাপকেরা তাঁর ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান এবং তাঁর ইংরেজী লেখার ক্ষমতা দেখে যথেষ্ট প্রশংসা করতেন। সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মেছিল তাঁর আরও চমৎকার, তিনি সুন্দর পরিষ্কার সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতাও করতে পারতেন।

বি, এ, পড়বার সময়েই তিনি তখনকার বিখ্যাত বিখ্যাত সংবাদপত্রে বাংলা প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতেন। সেই সময়

তাঁর "আর্য্যগাথা" নামে একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের ছোট বেলার অর্থাৎ ১২ থেকে ১৭ বছরের লেখা কতকগুলো গান ও কবিতা আছে। সে পুস্তকখানা পড়ে তখনকার বিখ্যাত বিখ্যাত লোকেরা সকলেই বালকের লেখাব খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। বি, এ, ক্লাশে পড়ার সময় থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল একজন কবি ও সাহিত্যিক ব'লে পরিচিত হ'তে আরম্ভ করেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে এম, এ পাশ করেন।

তখনো ম্যালেরিয়ার হাত থেকে তিনি অব্যাহতি পান নি। ঔষধপত্র অনেক খেলেন, অনেকের পরামর্শ মত অনেক স্বাস্থ্যকর জাযগায়ও ঘুরে এলেন, কিন্তু রোগ আর সারে না। শরীর একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার মত হলো। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে আত্মীয় স্বজনেরা ভীত হযে পড়লেন।

তখন তাঁর এক দাদা (নরেন্দ্রলাল) ছাপরা জিলার র‍্যাভেলগঞ্জ নামক স্থানে একটা হাইস্কুলে হেডমাষ্টারী করতেন। সে জায়গার স্বাস্থ্য ভালই ছিল, সেখানে গেলে দ্বিজেন্দ্রলালের শরীর শোধরাতে পারে মনে করে নরেন্দ্রলাল তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সেই স্কুলে একটা মাষ্টারী খালি ছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই চাকরীটা নিয়ে দাদার বাসায় থাকতে লাগলেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী দ্বিজেন্দ্রলালের জন্য জয়মাল্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে বেশীদিন স্কুলমাষ্টারী করতে হ'লো না। দুমাস পরেই তিনি গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন। তা'তে তাঁকে জানানো হ'য়েছিল, গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত একটী সরকারী বৃত্তি নিয়ে তিনি কৃষি বিদ্যা শিখতে বিলাতে যেতে ইচ্ছুক কি না? পত্র পেয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের আনন্দের সীমা রইলো না। কিন্তু তাঁর মনে একটা দারুণ সন্দেহ রইলো, মাতা পিতা তাঁর বিলাত গমনে সম্মত হবেন কি না।

বিলাতে গেলে একে জাত যাবার ভয়, এক ঘরে হ'য়ে থাকবার ভয়, তার উপর আবার তখন যারা বিলাত যেতো তাদের মধ্যে অনেকেই পূরা দস্তুর সাহেব হয়ে ধর্ম্মকর্ম্ম ও বাঙ্গালীযানা একেবারে ছেড়ে দিত, আত্মীয় স্বজন মা বাপের সঙ্গে পর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখতে লজ্জা বোধ করতো। এই সব কারণেই তখন অনেকে ছেলেকে বিলাত পাঠিয়ে ঘরের ছেলেকে পর করে দিতে রাজি হ'তো না। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান্ গোঁড়া ব্রাহ্মণ, তিনি যে পুত্রকে সহজে বিলাত পাঠাতে রাজি হবেন এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ঘোর সন্দেহ ছিল। তাই তিনি তাঁর বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রথমে মা বাপের কাছে ব্যক্ত করতে সাহসী হন নি।

প্রথমে তিনি দাদাদের অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। তাঁরা কেউ আপত্তি করলেন না, বরং আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলেন।

দাদাদের সম্মতি পেয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহস হলো। তখন তিনি গভর্ণমেন্টের অনুরোধ পত্রের উল্লেখ করে পিতাকে নিজের বিলাত গমনের ইচ্ছা জানালেন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র প্রথমে সম্মত হলেন না, কিন্তু শেষে পুত্রের একান্ত ইচ্ছা জেনে অনুমতি দিলেন।

এবার মায়ের অনুমতি। সে এক বিষম ব্যাপার। একে ত কাছ ছাড়া ক'রে সাত সমুদ্র তের নদী পারে বিদেশ-বিভূঁয়ে পাঠানো, তার উপর আবার খৃষ্টানের দেশ। স্নেহময়ী মা সে· অবস্থায় কিছুতেই তাঁর আদরের ধন দ্বিজুকে বিলাতে যেতে দিতে স্বীকৃত হলেন না।

পুত্রেরা সকলে মিলে তাঁকে বোঝাতে লাগলেন,—ভগবানের ইচ্ছায় যে সুবিধা দ্বিজু পেয়েছে, সে সুবিধা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। দেশে থাকলে জীবনের উন্নতি কিছুই হবে না, বিলাত থেকে পাশ ক'রে এলে দ্বিজু দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য বড লোক হতে পারবে। সে-দেশের স্বাস্থ্যও ভাল, শরীরটা ভাল হবে।

পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ভেবে মা আর আপত্তি করলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল জনক জননীর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে বিলাত যাত্রা করলেন। মাতাপিতার স্নেহ, দাদাদের ভালবাসা, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গসুখ এবং "ধনধান্য পুষ্পেভরা বসুন্ধরার" 'সেরা' দেশ জন্মভূমি ছেড়ে যেতে দ্বিজেন্দ্রলালের বড কষ্ট হ'য়েছিল।

তিন

লণ্ডনে একটা পরিবারের মধ্যে খরচা দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল থাকতেন। বাড়ীর কর্ত্রী দ্বিজেন্দ্রের সরল মধুর স্বভাবের জন্য তাঁকে বড় স্নেহ করতেন।

স্বদেশপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে দেশীয় আচার ব্যবহার যতটা সাধ্য মেনে চলতে চেষ্টা করতেন। এমন কি, অনেক সময় বাঙ্গালীর ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবী প'রে থাকতেন। সেই পোষাকেই রাস্তায় বেরুতেও তিনি লজ্জা বোধ করতেন না।

কিন্তু ইংরেজদের কতকগুলো বিশেষ গুণ, যা' থাকার দরুণ আজ তারা অর্দ্ধ জগতের উপর প্রভুত্ব করছে, আর যা না থাকার জন্যে আমাদের এত দুর্গতি, এত দুর্দ্দশা, দ্বিজেন্দ্রলাল সেগুলো খুব ভালভাবে লক্ষ্য ক'রেছিলেন। এবং সে সমুদয় গুণ যাতে আমরাও অভ্যাস করে জগতে একটা উন্নত জাতি ব'লে পরিচিত হ'তে পারি সে জন্যে তিনি অনেক কথা লিখে গেছেন। তাঁর প্রাণের ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালী ইংরেজদের দোষগুলো ছেড়ে দিয়ে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শ্রমশীলতা, সময়ানুবর্ত্তিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বাবলম্বন, সাধুতা, স্বদেশপ্রীতি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, সৎসাহস প্রভৃতি গুণগুলো শিক্ষা করুক,—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'।"

আর তিনি লিখেছেন,—ভারতবাসীদের যতদিন বর্ত্তমান

অবস্থার প্রতি একটা অসন্তুষ্টি না আসবে,—যতদিন তারা এই অবস্থায় থেকেই মনে করবে বেশ সুখে, বেশ আরামে আমাদের দিন কাটছে,—যতদিন তারা অধিকতর সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার জন্য একান্ত লালায়িত হয়ে না উঠবে, ততদিন তাদের এ দুর্গতি ঘুচবে না। অসন্তোষই জগতের সকল জাতির উন্নতির মূল। অসন্তোষই আবার ভারতবাসীদের নূতন জাতি করে তুলবে। অবস্থার উন্নতি করতে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতাটুকুও ছাড়তে হবে, বিলাসী হ'লে সে জাতের কখনো উন্নতি হয় না, বিলাসিতা জাতির পতনের মূল।—এই ছিল তাঁর বিলাতের অভিজ্ঞতা এবং স্বদেশবাসীদের প্রতি তাঁর উপদেশ।

বিলাতে পড়বার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের লেখা ইংরাজী কবিতাগুলো "লিরিক্স্ অফ্ ইণ্ড্" নামে একখানা পুস্তকে ছেপে বন্ধুদের উপহার দিয়েছিলেন। এরপর তিনি আর কোনো ইংরাজী রচনা প্রকাশ করেন নি। তিনি মনে ক'রেছিলেন, বাঙ্গালী হ'য়ে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করাই উচিত, বিদেশী ভাষার চর্চ্চা ক'রে আমাদের কোনো উন্নতি হবার আশা নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবন মাতৃভাষার চর্চ্চা করেই কাটিয়ে গেছেন।

বিলাতে দ্বিজেন্দ্রলাল খুব থিয়েটার দেখতেন। এই থিয়েটার দেখার দরুণ সেখানকার নাট্যশালা, নাটক এবং সঙ্গীত বিষয়ে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছিলেন।

সেই অভিজ্ঞতার ফলেই তাঁর অনেক গান বিলাতী ঢংএ রচিত হয়েছে। সে সুর বাংলায় আগে ছিল না, দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম তার প্রচার করেন। এখন তা' "ডি, এল্ রায়ের সুর" নামে এদেশে পরিচিত হ'য়ে পড়েছে।

১২৯২ সালে বিলাতে পাঠ্যাবস্থায় দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শোকে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। একমাস তিনি একেবারে বিমর্ষ হয়ে কাটিয়েছিলেন, তাঁর মুখে না ছিল হাসি, না ছিল কথা।

বিলাতে অবস্থান কালে পিতৃশোকই তাঁর শেষ শোক নয়। আরো একটা মর্ম্মভেদী দারুণ শোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা শেষ করে দ্বিজেন্দ্রলাল F R.A S. উপাধি পান, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তথাকার রাজকীয় কৃষিকলেজের ও রাজকীয় কৃষি সমিতির সদস্য নিযুক্ত হ'য়ে যথাক্রমে M R.A.C. এবং M.R.S.A.E. উপাধি লাভ করেন।

বিলাতের শিক্ষা শেষ করে যখন তিনি দেশে ফিরে আসবার আয়োজন করছিলেন সেই সময় তাঁর স্নেহময়ী মা পরলোক গমন করেন। সংবাদ এসেছিল দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীর কর্ত্রীর কাছে। পিতার মৃত্যুসংবাদে দ্বিজেন্দ্রলাল কি রকম হ'য়ে পড়েছিলেন তা' মনে করে তিনি তখন আর সে দুঃসংবাদ তাঁকে শোনালেন না, কেবল ব'লে দিলেন, তোমার মার বড্ড অসুখ, তুমি শীগ্‌গির দেশে ফিরে যাও।

মায়ের মরণাপন্ন অসুখের কথা শুনে দ্বিজেন্দ্রলাল পরের জাহাজেই দেশে রওনা হলেন। তখন তিনি জানতে পারেন নি যে, তাঁর "এই মানব জীবনের তপ্ত সৈকতে এই মাতৃ-স্নেহের অমৃত সমুদ্র" শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে, আর তিনি তাতে স্নান ক'রে তা' পান করে পবিত্র হতে পারবেন না।

জাহাজে আসতে আসতে পথে একজন বন্ধুর মুখে তিনি মায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনতে পেলেন। সেই নিদারুণ সংবাদে তাঁর মাথায় যেন হাজার বাজ একসঙ্গে ভেঙ্গে পড়লো, পৃথিবী তিনি অন্ধকার দেখতে লাগলেন। বড় আশা ক'রে তিনি চ'লেছিলেন, বাড়ী গিয়ে মায়ের চরণধূলি মাথায় নিয়ে মাকে বহুদিন পরে প্রাণ ভরে 'মা মা' ব'লে ডেকে ধন্য হবেন, মাতৃভক্ত পুত্রের সে আশা মুকুলেই শুকিয়ে গেল।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে কতবড় মাতৃভক্ত ছিলেন তাঁব রচিত নাটকের অনেক স্থলে সে পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর একখানা নাটকে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,—"মাতৃভক্তি—যে কর্ত্তব্য সর্ব্ব কর্ত্তব্যের মূল, জীবনে মহাশিক্ষা মনুষ্য-প্রকৃতির মজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম,—যা' একটা স্বর্গীয় প্রতিভায় মানব জীবনকে মণ্ডিত করে—আর মৃত্যুর সেই ভয়ানক মুহূর্ত্ত আলোকিত করে,—যে এই মাতৃভক্তির কাঙাল, তার আর কি আছে? জীবনে সে কি পাপ কাজ না করতে পারে। * * * সংসারে মায়ের বাড়া কেউ নেই,—ভগ্নী নয, কন্যা নয়, স্ত্রী নয়।"

চার

দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত থেকে দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজে তাঁর স্থান হ'লো না। অপরাধ—তিনি বিলাত-ফেরত। আত্মীয় স্বজনেরা তাঁর সঙ্গে খাওয়া বন্ধ করলেন। অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালকে সমাজে নিতে রাজি হ'লেন, যদি তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে যেতে স্বীকৃত হ'লেন না। তিনি বল্লেন, কি অপরাধের জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এমন কি পাপ কাজ তিনি ক'রেছেন? বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন, কোনো অন্যায় কাজ করতে ত তিনি যান নি। এর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত? কিন্তু কৈ, হিন্দু সমাজের মধ্যে বাস ক'রে অনেকে এমন সব ঘোর পাপ কাজ করছে, যার জন্য সত্যি তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত, কিন্তু সে জন্যে ত তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না, অনায়াসে তারা দিব্বি সমাজের মাথায় টেকা মেরে চ'রে বেড়াচ্ছে। আর যত দোষ হ'লো যাঁরা উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিলাতে যান তাঁদের? দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী হলেন না, তাই তিনি 'একঘরে' হলেন, সমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করলো।

একঘরে হ'য়ে দ্বিজেন্দ্রলালের যত রাগ পড়লো গিয়ে হিন্দু সমাজের উপর। তিনি ভীষণ ভাবে হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করে' তার সমস্ত দোষ ত্রুটি দেখিয়ে তীব্র ভাষায় একখানা বই লিখলেন। বইখানার নাম 'একঘরে'। তিনি মনের ঝাল ঝাড়তে গিয়ে বইখানাতে এমন অনেক কথাও লিখেছেন যা' হিন্দু সমাজের সত্যি সত্যি দোষ নয়। আবার ওতে এমন সব স্পষ্ট এবং উচিত কথাও আছে, যা' এর আগে কেউ বলতে সাহস করে নি, অথচ বলা উচিত, এবং সে সমস্ত দোষ হিন্দু সমাজে থাকা একেবারেই উচিত নয়। এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল একঘরে পুস্তক লিখে সমাজের অনেক উপকার ক'রে গেছেন।

হিন্দু সমাজের দলাদলি দেখে তিনি মনে বড় আঘাত পেয়েছিলেন। আর এই দলাদলিই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল তা' বুঝতে পেরে সমাজ যা'তে তার দোষ ত্রুটিগুলো সংশোধন ক'রে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করে সে জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল তাঁর 'একঘরে' পুস্তকে নয়, তাঁর অন্যান্য পুস্তকেও যেখানে বলবার সুবিধা পেয়েছেন সেখানেই প্রাণের দুঃখে তা' ব্যক্ত করেছেন। সমাজকে সে ভাবে আক্রমণ করায় তিনি হিন্দুসমাজের যথেষ্ট বন্ধুর কাজ ক'রেছেন,—শত্রুতার কাজ করেন নি, এক-তিলও।

তাঁর সময়েই কেউ কেউ বিলাত থেকে এসে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে স্থান নিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের ওপর

হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তিনি বলতেন—ওরা সেখানে কোনও জঘন্য অপকর্ম্ম ক'রেছে তাই প্রায়শ্চিত্ত ক'রে পাপমুক্ত হচ্ছে।

বিলাতফের্ত্তাকে একঘরে করা সম্বন্ধে তিনি তাঁর "বঙ্গনারী" নামক নাটকে দেবেন্দ্রের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন,—"যদি ওর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হত। না—সমাজের কাছে ও যে পরম অপরাধী। বিলেত-ফেরত! চুরি কর, জাল কর—সমাজ সব সইবে, কিন্তু বিলেত যাত্রা অমার্জ্জনীয়।"

বঙ্গনারীতেই আর এক জায়গায় আছে,—"যেখানে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কেশব সেন, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সেখানে একঘরে হওয়ায় লজ্জা নাই। সমাজ একঘরে কচ্ছে কাকে? যাঁর হৃদয় বালিকা বিবাহের জন্য কাঁদে, যে অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারে না, যার স্ত্রী না খেতে পেয়ে রাস্তায় বেরোয়, যে বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাত যায়, তাকে সমাজ একঘরে কচ্ছে, আর যে লম্পট, ব্যভিচারী, জালিয়াৎ, চোর, স্ত্রী-ঘাতক,—যে তিনবার জেল খেটে এসেছে,—যে শত নিরীহ প্রজার ঘর পুড়িয়ে কি সরিকের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে, হত্যায় হাত দু'খানি রাঙিয়ে এসে সেই হাতের বুড়ো আঙ্গুলে টাকা ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দিতে পারে, এই সনাতন সমাজ তার মাথার ওপর হাত বুলোয়। বিদ্যাসাগর হলেন একঘরে—আর মোহন্ত হলেন পরম ধার্ম্মিক।"

দলাদলি আমাদের সমস্ত উন্নতির প্রতিবন্ধক, তাই তিনি আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন,—

"ছেড়ে দলাদলি
কর গলাগলি।
ছেড়ে রেষারেষি
কর মেশামেশি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সত্যপ্রাণ, বহু চিন্তার পর যা' তিনি সত্য বলে ধরতেন, আজীবন সেই মত পোষণ ক'রে চলতেন। আজ এক মত কাল আর এক মত, এ রকম ভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। কাজেই হিন্দুসমাজের দলাদলি, একঘরে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে সত্য ধরতে পেরেছিলেন, আজীবন তার মূল সূত্রটী তিনি পরিত্যাগ করেন নি। তবে শেষের দিকে সামান্য সামান্য বিষয়ে তাঁর যে মতের একটু পরিবর্ত্তন হয় নি, তা' একেবারে বলা চলে না।

পাঁচ

বিলাত থেকে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি চাকরী পেয়েছিলেন।

বিলাতী আচার ব্যবহার, বিলাতী আদব কায়দা, এমন কি বিলাতী সাজসজ্জা প্রথম জীবনে তাঁকে খুবই মুগ্ধ ক'রেছিল। শুধু দ্বিজেন্দ্রলালই যে এই বিদেশী সভ্যতার মোহে ভু'লেছিলেন তা' নয়, অধিকাংশ বিলাত ফেরত বাঙ্গালীরই দশা এই। অনেকে জীবনে এই বিলাতী মোহের দাসত্ব থেকে আব অব্যাহতি পেতে পারেন না।

বিলাত থেকে ফিরে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন দেখলেন সমাজ তাঁকে দূরে ঠেলে দিল, তখন হয়ত সমাজের উপর রাগ করেই তিনি তা' থেকে আরো দূরে স'রে থাকবার জন্য বিলাতী চালচলন সাজপোষাক নিজের ব'লে গ্রহণ করলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল হলেম তখন পূর্ণমাত্রায় সাহেব, সাহেবীয়ানা পুরাদস্তুর তিনি আয়ত্ত করে নিলেন। এমন কি, নিজের নামটা পর্য্যন্ত সাহেবী কায়দায় লিখতে লাগলেন,—মিঃ ডুইজেন লালা রে (Mr. Dwijen Lala Ray)। তখন থেকেই তিনি ডি, এল, রায় নামে পরিচিত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু এই বিদেশী সভ্যতার মোহ তাঁকে বেশী দিন ভুলিয়ে রাখতে পারলো না। কিছুদিন পরেই তাঁর ভুল ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, কাঞ্চন ছেড়ে কাঁচ ধরতে যাচ্ছেন, অমৃতের হ্রদ অবহেলা করে তিনি মরীচিকার পেছনে ছুটেছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, বিলাতী সাজপোষাক, বিলাতী আচার ব্যবহার সে দেশের লোকের জন্য, তা' আমাদের জন্য নয়, আমাদের তাতে ঘোর অবনতি ছাড়া কোনো উন্নতিই হবে না। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন সাহেবী সাজপোষাক একেবারে ছেড়ে দিলেন,—অবশ্য বাড়ীর জন্য, আফিসে চাকরীর খাতিরে সে পোষাক পরতেই হ'তো।

বিলাত থেকে এসে প্রথম প্রথম তিনি মনে করতেন, বিলাত ফের্ত্তারাই হচ্ছে প্রকৃত মানুষ, জ্ঞানে, সভ্যতায়, আচার ব্যবহারে এদেশের লোকদের চাইতে ঢের উঁচুতে তারা, তাঁর "একঘরে" পুস্তকেও তিনি এ কথাই লিখেছিলেন। শেষে দেখে শুনে বিচার-বিবেচনা করে তাঁর সে ভ্রম দূর হলো। শুধু দূর হওয়া নয়, বিদেশী সাজপোষাক এবং আচার ব্যবহারের অনুকরণ করাকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখতে লাগলেন। এ দেশীয় যে সব বিলাত ফেরতা বিলাতী ঢংএ চলতো তিনি তাদের তীব্র ভাষায় বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি।

যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর "একঘরে" পুস্তকে বিলাত ফেরতা-দের গুণগান করেছিলেন সেই দ্বিজেন্দ্রলালই আবার তাঁর

"প্রায়শ্চিত্ত" নামক পুস্তকে ও অন্যান্য হাসির গানে বিলাত ফেরতাদের কতকগুলো জঘন্য দোষ দেখিয়ে রীতিমত চাবুক মেরে গেছেন।

"প্রায়শ্চিত্তে" চম্পাটী নামে একজন বাঙ্গালী বিলাত ফেরত আবার পুরাদস্তুর হিন্দু হ'য়ে পূর্ব্বের মতিভ্রমের জন্য অনুতাপ ক'রে বলছে,—"বেঁচেছি, বাপ্! বিলিতী চাল কি আমাদের দেশে পোষায়? বিলিতী লাঙ্গল কি আমাদের দেশের গরুতে টানতে পারে? না বিলিতী পোষাক বাঙ্গালীর অঙ্গে শোভা পায়? না বিলিতী খানা এ দেশে সহ্য হয়? একে তো এ দেশের সঙ্গে খাপ খায় না, তার উপর বিপর্য্যয় খরচ। বাপ্! সাহেবী করা কি এ গরীবের দেশে পোষায়? চেয়ার চাই, টেবিল চাই, ক্যাবিনেট চাই, আরাম-চেয়ার চাই। আর্য্য ঋষিগণ কেমন সুবিধা ক'রে দিয়ে গেছেন দেখ দেখি! একখানা তক্তাপোষের উপর এক শতরঞ্চ বিছোও—তা'তে যত খুশী লোক বোস, শোও, নাচো, গাও আর গুড়গুড়ি টানো, ব্যাস্। এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, ছেঁড়া পেণ্টেলুনের চেয়ে ছেঁড়া ধুতি চাদরই বাঙ্গালীর অঙ্গে শোভা পায়,—দেখতে পাচ্ছি যে, ছেলেমেয়ে গুলোকে ফিরিঙ্গীর ছেলে করার চেয়ে বাঙ্গালীর ছেলে করাটাই বহুৎ আচ্ছা। দেখ্‌ছি যে, বিলিতী চালের চেয়ে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশী চালই বহুৎ আচ্ছা। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীয়ানাই বহুৎ আচ্ছা!"

বিলাতফেরতাদের নিন্দা ক'রে দ্বিজেন্দ্রলালের একটা গান আছে,—

আমরা বিলাতফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট্ বুট আর প্যাণ্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতী বাঁদর,
ইত্যাদি

ছয়

বিলাত থেকে ফিরে আসার কিছু দিন পরে কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা সুরবালা দেবীর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহ হয়। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ণমাত্রায় সাহেব এবং 'একঘরে' পুস্তকের লেখক। তাই মজুমদার মশায় তাঁর সঙ্গে প্রথমে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হন নি। কিন্তু যখন শুনলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুমতে বিয়েরই পক্ষপাতী, তখন প্রতাপচন্দ্রের আর কোনো আপত্তি রইলো না। ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে শুভ দিনে শুদ্ধ হিন্দু মতে বিয়ে হয়ে গেল। তাঁর দাদারা সকলেই এবং কোনও কোনও আত্মীয় এ বিবাহে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক আত্মীয় স্বজন সমাজের ভয়ে যোগ দিতে সাহস করেন নি। বিবাহে তিনি এক পয়সাও পণ নেন নি।

বিয়ের কিছুদিন পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষিবিভাগে বেশ বড একটা চাকরী পেয়ে মুঙ্গের চলে গেলেন। বিবাহিত জীবনের কয়েকটা বছরই দ্বিজেন্দ্রলালের বড সুখে কেটেছিল। সে সময় তাঁর হাসির ফোয়ারা, গানের উৎস যেন শতমুখে

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে হাসির ও গানের যেন বিরাম ছিল না—তাঁর প্রায় অধিকাংশ হাসির গান ও কবিতা এবং প্রহসন এই সময় রচিত ও প্রকাশিত হয়। তা' ছাড়া নাট্যকাব্য 'পাষাণী' এবং 'সীতা' ও 'মন্দ্র' কাব্যও এই সময় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম নাটক 'তারাবাঈ' এই সময় লেখা হয এবং তা যখন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় তখন সকলেই একবাক্যে সে নাটকের প্রশংসা করেছিলেন।

মুঙ্গেরে এসেই তিনি ওস্তাদ রেখে রীতিমত গান শিখতে আরম্ভ করেন, এবং কালে একজন বেশ ভাল গাইয়ে হ'য়েছিলেন।

পত্নী সুরবালা সত্য সত্যই 'সুরবালা' ছিলেন। রূপে গুণে, বুদ্ধিতে, স্বামিসেবায, গৃহকার্য্যে, হাস্যকৌতুকে তিনি স্বামীর জীবন সুন্দর আনন্দময় করে রেখেছিলেন। গুণবতী পত্নীর গুণে দ্বিজেন্দ্রলালের মধুর জীবন মধুরতর হয়েছিল।

সুববালা একটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করেন। পুত্রটীব নাম দিলীপকুমাব, কন্যাটীর নাম মায়াদেবী। সুরবালা ধীরে ধীরে সুখের সংসার সুন্দরতর করে গড়ে তুলছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বিধাতার অভিশাপ এসে পড়লো তাঁদের উপর। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে একটী মৃতা কন্যা প্রসব ক'রে সুরবালা স্বামীর আনন্দময় সংসার অন্ধকার করে পুত্রকন্যা দুটীকে শোকের সাগরে ভাসিযে সুরলোকে প্রস্থান করলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবাসে কার্য্যোপলক্ষে নির্ভাবনায় আনন্দে

দিন কাটাচ্ছিলেন, পত্নী ও পুত্রকন্যা ছিলেন কলকাতায়। হঠাৎ পত্নীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে উন্মাদের মত দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতায় ছুটলেন। কিন্তু হায়, সুরবালার সঙ্গে শেষ দেখা তাঁর ভাগ্যে হলো না, স্বামী এসে পৌঁছুবার আগেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে সুরবালা মহাপ্রস্থান করলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাড়ী এসে দেখলেন, ঘর শূন্য, ঘরের দেবী প্রতিমা নাই,—সুরবালা তাঁর জীবন মরুভূমি করে চলে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। শিশু মাতৃহারা পুত্রকন্যা দুটী পিতাকে দেখে হাহাকার করতে করতে যখন এসে তাঁর কোলে নিতান্ত নিরাশ্রয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন দ্বিজেন্দ্রলালের আর সে দৃশ্য সহ্য হলো না। কিন্তু শিশু দুটীর মুখ চেয়ে তিনি বুকের অসহ্য ব্যথা বুকে চেপে রেখে তাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। পত্নীকে হারিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মনে হ'তে লাগলো, তিনি সব হারালেন, মাতাপিতা আগেই স্বর্গে চ'লে গেছেন, সমাজ তাঁকে পরিত্যাগ ক'রেছে, পত্নীই এতদিন তাঁর সে অভাব ভুলিয়ে রেখেছিলেন, তিনিও ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলেন। এখন তাঁর সংসারে অবলম্বন রইলো কেবল ঐ দু'টী মাতৃহারা শিশু। তারাই এখন হ'লো তাঁর মরুময় জীবনের একমাত্র শীতল ছায়া, অন্ধকার জীবনপথের একমাত্র আলোক, শূন্য জীবনের একমাত্র অবলম্বন, হতাশ জীবনের একমাত্র আশা,—একমাত্র লক্ষ্য।

পত্নী বিয়োগের সময় দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স ছিল ৩৮

বৎসর। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই আবার তাঁকে বিয়ে ক'রে শূন্য সংসার পূর্ণ করতে অনুরোধ ও জেদ করতে লাগলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এখনো বয়স বেশী হয় নাই, এ বয়সে আবার বিয়ে করা উচিত, এ বিষয়ে নানা রকম যুক্তি তর্ক তারা দেখাতে লাগলেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল আর কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হ'লেন না, তাঁর এক কথা,—"আর বে করবো না।"

মৃতা পত্নীর স্মৃতি বুকে নিয়ে, পুত্রকন্যা দু'টীর মুখ দেখে আর সাহিত্যসেবা ক'রে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে তিনি সঙ্কল্প করলেন।

সাত

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন বড্ড স্বাধীনচেতা, স্পষ্ট-বক্তা, সত্য-প্রবণ এবং অন্যায়ের বিরোধী। চাকরী করতে গিয়ে এসব গুণগুলো যাঁরা বজায় রাখতে যান চাকরী-জীবনে তাঁরা বড় সুবিধা করতে পারেন না। উপরওয়ালাদের সঙ্গে তাঁদের রেষারেষি লেগেই থাকে। দ্বিজেন্দ্রলালেরও হ'য়েছিল তাই, চাকরী-জীবনে তিনি তাঁর ঐ সব গুণগুলোর জন্য বিশেষ উন্নতি করতে পারেন নি। তাঁর মনের বলের পরিচয় পেয়ে উপরস্থ সাহেব কর্ম্মচারীরাও তাঁকে একটু সম্মান এবং ভয়ের চক্ষে দেখতো। তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল খুব, যা তিনি করতেন তা'তে খুঁৎ থাকতো না কিছু। আর তাঁর মধুর ও সরল ব্যবহারে এবং মিষ্টি কথায় অধীন কর্ম্মচারীরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতো ও ভালবাসতো।

যখন তিনি ডিরেক্টার অব্ এগ্রিকালচারের অধীনে চাকরী করতেন তখন তাঁকে অনেক জায়গায় জমী জরিপ করতে যেতে হ'তো। এই জরিপের কার্য্যে সন্তুষ্ট হ'য়ে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বর্দ্ধমান ষ্টেটে সুজামুটার সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত করেন। তখন নিয়ম ছিল, জরিপে প্রজাদের জমী বেশী

আছে প্রমাণ হ'লে সে অনুসারে খাজনাও বৃদ্ধি ক'রে দেওয়া হ'তো। এতে গরীব প্রজাদের উপব অন্যায় করা হ'তো যথেষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলাল সেটেলমেণ্ট অফিসার হ'য়ে এ অন্যায নিয়ম বন্ধ ক'রে দিতে চাইলেন। এই ব্যাপার নিয়ে উপর-ওয়ালাদের সঙ্গে তাঁর রীতিমত তর্ক চলতে লাগলো। এমন কি ছোটলাট সাহেব পর্য্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল .নির্ভীকচিত্তে তাঁকে পর্য্যন্ত বলেছিলেন,—"আপনি সেটেলমেণ্টের কাজ বোঝেন না।" একজন সেটেলমেণ্ট অফিসার বাংলার ছোটলাটের মুখের ওপর এমন তাজা গরম জবাব দিতে পারে—ছোটলাট সাহেবের এ ধারণা ছিল না। সাহেব রাগ ক'রে দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রমোশন বন্ধ ক'রে দিলেন। কিন্তু শেষে দ্বিজেন্দ্র-লালেরই জয় হ'য়েছিল। হাইকোর্ট দ্বিজেন্দ্রলালের অভিমতই সঙ্গত ব'লে রায় দিয়েছিলেন। এবং সেই থেকে আইন হয় যে, জরিপে প্রজাদের জমী বৃদ্ধি হলেও খাজনা বাড়ানো চলবে না। এতে গরীব প্রজাদের যে কত উপকার হ'লো, তা' ব'লে শেষ করা যায় না।

তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল আবগারী বিভাগের প্রথম ইনস্পেক্টার হ'ন। প্রায় ৮ বছর তিনি এ কাজে ছিলেন। তখন তাঁকে বাংলা দেশের নানা জায়গায় ঘু'রে বেড়াতে হ'তো। এতে তাঁর যেমন হ'য়েছিল বাংলাদেশের নানা স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখবার সুবিধা, তেমনি হ'য়েছিল নানা স্বভাবের

নানারকম লোকের সঙ্গে মিশে তাদের স্বভাবচরিত্র বুঝবার সুবিধা। বাংলা দেশময় ঘু'রে ঘু'রে দেশের প্রতি তাঁর অন্তরের ভালবাসা ক্রমেই গভীর হ'য়ে পড়ছিল। এ সময় তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই লোকদের তাঁর হাসির গান শুনিয়ে মুগ্ধ ক'রে আসতেন। তখনো সুরবালা দেবী জীবিতা, দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ। মহা সদানন্দ পুরুষ তিনি তখন।

সুরবালার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রাণের আনন্দের ফোয়ারা, হাসির ঝর্ণা শুকিয়ে গেল। হঠাৎ যেন তিনি আর একটী ভিন্ন রকমের মানুষ হ'য়ে পড়লেন। লোকের সঙ্গে বেশী মেশামেশি হাসি তামাসা গান সবই যেন শেষ হ'য়ে গেল। সে হাসি, সে আনন্দ আর ফুটলো না। তাঁর লেখাতেও একটা গম্ভীর ভাব, বিষাদের গান, দুঃখের ব্যথা এসে পড়লো। পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রলাল যা লিখেছিলেন তা সবই ঐ রকম। তিনি নিজেই লিখেছেন—

"নাহি শোভে হাসি আর,
আজি দিন কাঁদিবার,
হেসেছি হৃদয় ভরি' সুখের হাসির দিনে।"

তাঁর 'বঙ্গনারী' নাটকে তিনিই যেন সদানন্দ রূপে বলেছেন, —"প্রেমের গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সে দিন গিয়েছে। হাসি তামাসার দিন গিয়েছে,—আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে।"

সময়ে সকলই হয়, দ্বিজেন্দ্রলালেরও স্ত্রী বিয়োগের ব্যথা কিছু ক'মে এসেছিল, নিজকে বুঝিয়ে তিনি সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা ক'রেছিলেন—

"দুঃখ মিছে, কান্না মিছে,
দু'দিন আগে দু'দিন পিছে,
একই পাথারে গিয়ে মিলেছে সব নদী।"

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রলালের আবগারী বিভাগের ঘুরে বেড়ানো চাকরী আর ভাল লাগলো না, তিনি আবার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি চাকরী গ্রহণ করলেন।

সুরবালা দেবীর পরলোক গমনের কয়েক মাস পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর শোকাচ্ছন্ন মনটাকে অন্য কাজে ব্যাপৃত রাখবার জন্য আবাব নূতন উদ্যমে সাহিত্যালোচনা আরম্ভ করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই 'প্রতাপ সিংহ' নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব জোরে চলছিল, সকলেই 'প্রতাপ সিংহের' অভিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি নেওয়ার অল্প দিন পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল এক বছরের ছুটী নিয়ে কলকাতায় বাস করেন। চাকরী দাসত্ব, তাই তাঁর চাকরী মোটেই ভাল লাগছিল না, কিন্তু চাকরী না করলে কি খাবেন? এই জন্যই চাকরীর মায়া কাটাতে পারেন নি। তাঁর উপর সরকার পক্ষের সুনজর ছিল না মোটেই, কারণ তিনি পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী, তার উপর আবার ক্রমে ক্রমে

"দুর্গাদাস", "মেবারপতন", "নূরজাহান", "সাজাহান" ইত্যাদি স্বদেশী ভাবাপন্ন নাটকগুলি রচনা করছিলেন। "বঙ্গ আমার জননী আমার" প্রভৃতি স্বদেশী গানগুলোও তিনি এসময় লিখতে সুরু করেন। এই স্বদেশী ভাবের জন্য চাকরী-জীবনে তাঁর আর উন্নতি হয়নি এবং লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হ'য়েছিল কম নয়।

ছুটি নিয়ে কলকাতায় বাস করবার সময় তাঁর বাড়ীতে প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে বিকেল বেলায় সাহিত্যিকদের এক মিলন-বৈঠক বসতো, সে সভার নাম ছিল "পূর্ণিমা-মিলন"। সেখানে কবিবর রবীন্দ্রনাথ থেকে ছোট বড় অনেক কবি এবং সাহিত্যিক মিলিত হ'য়ে নানা আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ, তর্ক এবং গান বাজনা করতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কর্ম্মস্থানে চ'লে যাওয়ায় শেষে "পূর্ণিমা মিলন" বন্ধ হ'য়ে যায়।

পত্নীর মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতা নন্দকুমার চৌধুরীর লেনে একখানা নূতন বাড়ী তৈরী করে স্ত্রীর নাম অনুসারে তার নাম রাখেন "সুরধাম"। নন্দকুমার চৌধুরী লেনের এখন "ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট" নামকরণ হয়েছে। এই সুরধামেই তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত হয়।

আট

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় চার বছর কলকাতায় আলিপুরের ট্রেজারি অফিসার, জয়েন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি কাজে কাটিয়েছিলেন। এই চার বৎসর তিনি তাঁর "সুরধামে" ছিলেন। এখানে "সীতা", "সোরাব রুস্তম", "পুনর্জ্জন্ম", "চন্দ্রগুপ্ত", "ত্রিবেণী", "পরপারে", "আনন্দ বিদায়", "বঙ্গনারী", "সিংহল বিজয়" ইত্যাদি পুস্তকগুলো রচনা করেন।

এই সুরধামেই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র দিলীপকুমারের উপনয়ন সম্পন্ন করেন। এই উপনয়ন উপলক্ষে অনেক আত্মীয় স্বজন, যারা একদিন দ্বিজেন্দ্রলালকে একঘরে ক'রেছিলেন, তাঁরা এসে যোগ দেন। এতে দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হ'য়ে তাঁর এক বন্ধুকে ব'লেছিলেন, "ভেবেছিলাম, এ জীবনে বুঝি কেবল ঐ একঘরে হ'য়েই কাটাতে হবে। কিন্তু আজ ভাই, আমি যেন একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব কচ্ছি।"

এই উপনয়ন উপলক্ষে যে সব বৈদিক মন্ত্র পাঠ, ক্রিয়াকলাপ ও যাগযজ্ঞ হ'য়েছিল তা' দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন,— "এসব অনুষ্ঠানের আচার ও মন্ত্রাদিতে যে এমন একটা

বৈদ্যুতিক পবিত্র ভাব আছে, তা' এর আগে আমি কখনও কল্পনা কর্ত্তে পারি নি। কি চমৎকার উপদেশ। * * * আচ্ছা আবার কি আমরা তেমনটী হব না।"

সুরধামের সুমুখের খোলা মাঠে অনেক সময় দ্বিজেন্দ্রলাল পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিতান্ত সরল-প্রাণ শিশুর মত খেলায় মেতে থাকতেন। শিশুরা তাঁকে তাদেরই মত একজন ভেবে তাঁর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে খেলায় যোগ দিত।

কলকাতা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঁকুড়ায় বদলি করা হয়। বাঁকুড়ায় তিন চার মাস থাকার পর আবার তিনি মুঙ্গেরে বদলি হন। এই সময় কয়েক দিনের জন্য তিনি কলকাতায় আসেন।

সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হ'য়ে দ্বিজেন্দ্রলালের শরীর তখন ক্রমে ভেঙ্গে পড়ছিল। ডাক্তারেরা তাঁকে কিছুদিন কাজকর্ম্ম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। তাঁদের উপদেশ অনুসারে তিনি ছুটী নিলেন।

ডাক্তারদের উপদেশ মত তিনি এ সময় নিরামিষ আহার আরম্ভ করেন, কিন্তু মানসিক পরিশ্রম বন্ধ রাখতে পারলেন না। পূর্ব্বের মতই সাহিত্যসেবা চলতে লাগলো, বন্ধুবর্গসমাগমে তেমনি সুমধুর সঙ্গীতে তাঁদের চিত্তবিনোদন করতে লাগলেন, তেমনি নানাবিধ বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে তর্ক বিতর্ক চলতে লাগলো। —এ সব না ক'রে যেন তিনি তৃপ্তি পেতেন না।

সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি "ভারতবর্ষ" নামক এক-খানা মাসিকপত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করলেন। এই নূতন মাসিক পত্রখানা যাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র হয়, সে জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল গুরুতর পরিশ্রম করতে আরম্ভ করলেন। এই পরিশ্রমে তাঁর শরীর আরো ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু যার জন্য এত প্রাণপাত পরিশ্রম, দ্বিজেন্দ্র-লাল সেই অতি সাধের "ভারতবর্ষ" প্রকাশিত হ'তে দেখে যেতে পারলেন না। "ভারতবর্ষ" বেরুবার অল্প কিছুদিন আগেই তিনি চির বিদায় গ্রহণ করলেন। আজও "ভারতবর্ষ" নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই।

সেদিন শনিবার। ১৩২০ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্র-লাল বিকেলে তাঁর ঘরে ব'সে শেষ নাটক "সিংহল বিজয়" খানা কাটকুট ক'রে সংশোধন করছিলেন। নীচে "ইভিনিং-ক্লাবের" কয়েকজন সভ্য খেলা করছিলেন। লিখতে লিখতে ক্লান্ত হ'য়ে হঠাৎ তাঁর চাকরকে ডাক দিয়েই তিনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন। লোকজন ছুটে গেল। ডাক্তার ডাকা হ'লো। সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা রীতিমত চলতে লাগলো। কিন্তু কিছুই ফল হ'লো না।

রাত সওয়া ন'টার সময় একবার মাত্র আধ আধ স্বরে আদরের পুত্র মণ্টুকে (দিলীপ) ডেকেই তিনি অনন্ত নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ঘুম আর ভাঙ্গলো না।

পুত্রকন্যা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনগণের বিলাপ ও হাহা-কারে সুরধাম পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হ'য়েছিল মাত্র ৫০ বৎসর।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র জীবনে আমরা তাঁকে তিন রকমের দেখতে পেলুম। বাল্যে তিনি ছিলেন রুগ্ণ চপলতাবিহীন, শান্তিপূর্ণ,—যৌবনে হাস্যকৌতুকের অনন্ত প্রস্রবণ সদা হাস্যময়-পুরুষ,—প্রৌঢ়ে গম্ভীর, দেশ ও সমাজ হিতাকাঙ্ক্ষী নিষ্ঠাবান খাঁটি ব্রাহ্মণ।

চরিত্র ছিল তাঁর পবিত্র, কোনো দোষ স্পর্শেনি তাতে। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের একনিষ্ঠ সেবক স্বদেশপ্রাণ, নির্ভীক স্পষ্টবাদী। যা' তিনি অন্যায় ব'লে মনে করতেন, তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র ভয় করতেন না, ন্যায় এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি চাকরীর মায়া ভুলে যেতেন। লোকমতকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। তাঁর কোনো নিন্দার কথা কাণে এলে হেসে উড়িয়ে দিতেন আর বলতেন,—"লোকের কথায় ক'রোনা প্রত্যয়, লোকে কি না বলে।" প্রথম যৌবনের অনেকগুলো গোঁড়ামিকে তিনি শেষে অন্যায় বুঝতে পেরে সেগুলো একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন, শুধু পরিত্যাগ নয়, কঠোর বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি।

সমস্ত গুণের চাইতে আমরা তাঁর মধ্যে বেশী পরিস্ফুট দেখতে পাই স্বদেশ প্রেম,—জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা, এই

পতিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতিকে তু'লে ধরবার একান্ত চেষ্টা।—তাঁর প্রত্যেক পুস্তকে ছিল সেই এক সুর। স্বদেশই তাঁর ছিল "দেবী", স্বদেশই ছিল তাঁর "সাধনা", জন্মভূমিই ছিল তাঁর "স্বর্গ।" "আমার দেশ" বল্‌তে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন।

একমাত্র "বন্দেমাতরম্‌" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেহ সরকারী চাকরী-জীবনে এমন প্রাণ খু'লে স্বদেশমন্ত্র প্রচার করতে সাহস করে নি।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনাকাঙ্ক্ষাও দ্বিজেন্দ্রলালের কম ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন, হিন্দু মুসলমানের মিলন না হ'লে এদেশের মুক্তি নাই। তাঁর অনেক নাটকে তিনি এ কথা বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

বাংলার নারী জাতি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের ধারণা ছিল অতি উচ্চ। তাঁর মত করে আর কোনো বাঙ্গালী কবি বোধ হয় বঙ্গনারীর প্রশংসা ও স্তুতিগান করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন,—"আমার বিশ্বাস যে, বাঙ্গালী এ দুর্দ্দিনে যে এখনও মুখ তু'লে চাইতে পারছে, তা' এই নারী জাতির ধর্ম্মবলে।" আমাদের দেশে ও সমাজে বিদেশীয় ও বিজাতীয় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। "বঙ্গনারী" নাটকের বিনোদিনী ও সুশীলার চরিত্র চিত্রণ তার প্রমাণ।

সে দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই। বাংলার সেই সাহিত্যকুঞ্জের

কোকিল চিরদিনের জন্য নীরব হ'য়ে গেছে। কে আর বাঙ্গালীকে সে হাসির গান শোনাবে?—কে আর বাঙ্গালীকে দুঃখ দৈন্য ভুলে "আবার তোরা মানুষ হ' " বলে উপদেশ দিবে? কে আবার আমাদের প্রাণে অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে গাইবে,—

"চোখের সামনে ধরিয়া রাখিযা অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেব ভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথাব উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।"

জানি না, ভগবান্ দ্বিজেন্দ্রলালের অভাব কবে পূরণ করবেন?

-শেষ—